গল্প ৩

বনমালী

মারা গিয়ে যে রাধা তাকে এতটা ভালোবাসবে, এরকমটা বনমালী ভাবেনি। অনেক কিছুই ভাবেনি আগে। রাধার মারা যাওয়ার কথাই-বা ভাববে কেন হঠাৎ?

তবে সেসব পরের কথা। এখন তাপসের চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে বনমালী। সসপ্যানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চায়ের মধ্যিখানটা ফুটে উঠছে গুলিয়ে গুলিয়ে। তাপস মাঝে মাঝে নেড়ে দিচ্ছে যাতে উথলে না ওঠে। আর গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বনমালীকে লক্ষ করছে আড়চোখে।

শেষ কয়েক দিন ঝড়ের গতিতে কেটেছে বনমালীর। কখনো ডুবেছে, হাঁসফাঁস করে ভেসে উঠেই, আবার ডুবে গিয়েছে। এখন হাতে সময়ও ভীষণ কম। কিন্তু একটা চা না খেয়ে নিলে মাথাটা যা জমাট বেঁধে আছে, খুলবে না। সোজা চিন্তা করাটা খুব দরকার।

রাধাকে যতই মন থেকে বার করার চেষ্টা করেছে, ঘুরে-ফিরে আরও ফিরে এসেছে। আর এখন তো সব কিছু শেষ হয়ে গেল। পেছনে যে লোক লেগেছে, বুঝে গিয়েছে বনমালী। অল্প সময়েরই যা অপেক্ষা।

অন্যমনস্ক হয়ে চুমুক লাগিয়ে জিভটা পুড়ে যায় বনমালীর। তাপস খেয়াল করছিল। বলল, 'কীরে বুনো, আজ মনটাকে কোথায় রেখে এলি? তারপর হেসে বলে, চুলটুলও আঁচড়াসনি মনে হচ্ছে, সব ঠিক?' বনমালীও হাসার চেষ্টা করে। পারে না, বেঞ্চিতে বসে পড়ে ধপ করে। ইতিমধ্যে তাপসের আরেক খদ্দের এসে পড়ায় প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কীই-বা বলার আছে? তাপসের কথার উত্তরে অনেক মিথ্যে বলতে হবে তাকে। গত কয়েক দিন মিথ্যে ছাড়া কিছু বলেওনি বনমালী। তবে যত কম বানাতে হয়, তত ভালো।

চুলের বাহার নিয়ে গর্ব ছিল তার। তাপস সেটাই ইঙ্গিত করছিল। পকেটে একটা সরু দাঁত চিরুনি সবসময়ে থাকত। না নিয়ে বেরোতই না। অন্যমনস্কভাবে পেছনের পকেটে হাত দিয়ে দেখে বনমালী, এখন নেই। গত কয়েক দিন ধরেই নেই নিশ্চয়ই। পিঠের দিক থেকে রোদ এসে তার ছায়াটাকে সামনে এঁকে দিয়ে গেছে, সেই ছায়ার উশকোখুশকো চুলের দিকে তাকিয়ে দেখে বনমালী। রাধার সঙ্গে প্রথম আলাপের কথা মনে পড়ে তার।

বনমালী অভ্যাসমতো টেরি কাটছিল সাবিত্রীর মোড়ে টোটো লাগিয়ে। প্রথমে চুলগুলো টানটান করে পেছনে আঁচড়িয়ে, তারপর মাঝখান থেকে সিঁথি করে দু-দিকে পাট করে নেয়। বনমালীর চেহারা চোখে পড়ার মতো নয় বললেই চলে, ফলে চুলের এই পরিচর্যা বন্ধুদের ছাড়া কারোরই চোখে পড়ে না। যা-ই হোক, আয়নায় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎ বগলের তলা দিয়ে চোখ যায় তার পেছনের সিটে সুন্দরমতো মেয়েটার দিকে। ফিকফিকিয়ে হাসছে তার কাণ্ড দেখে।

রাধা চিরকালই একটু প্রগল্‌ভ। চোখাচোখি হওয়াতে বলে, 'কেষ্টঠাকুর তো পুরো!' রাস্তায় ঘাটে অচেনাদের সঙ্গে ভাব পাতাতে তার অসুবিধা হয় না। এদিকে বনমালী নিজের চুল নিয়ে মোহিত হয়ে ছিল, পেছনে কে বসেছে, খেয়াল করেনি। একটা কাজের বউ জিজ্ঞেস করল বটে পাহাড়ির দিকে যাবে কি না, কিন্তু সেটা যে রাধা, তা বনমালী দেখে ওঠেনি, এতটাই ব্যস্ত ছিল নিজেকে নিয়ে।

দিনটা অন্যান্য দিনের থেকে অনেকটাই খালি যাচ্ছিল। অন্য সওয়ারি আসার কোনো নামও নেই। চুলের প্রসঙ্গে কেউ মজা-টজা করলে বনমালী একটুতেই খেপে যায়, তাই বন্ধুরাও টিটকিরি মারতে ছাড়ে না। কিন্তু রাধার চোখে কী যেন একটা আছে। সেও হেসে ফেলে। বলে, 'দেখনদারির দুনিয়া ছোটোবোন, একটু না করলে হবে? কদ্দুর যাবে?' রাধা চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'ছোটোবোন নাকি! যাব পাহাড়ির দিকে। কেন, বাড়ি পৌঁছে দেবে না কি?'

কোনো কথা না বলে টোটোতে স্টার্ট দেয় বনমালী। 'এ কী, এ কী' বলে হেসে গড়িয়ে পড়ে রাধা— 'আর কাউকে তুলবে না? এ তো সত্যিই কেষ্টঠাকুর দেখছি!'

স্পিড তোলে বনমালী। বলে, 'আমার রথ, আমার ইচ্ছে কাকে তুলব-না-তুলব!' গাড়িকে রথ বলে নিজেই বেমালুম খুশি হয় বনমালী, এরকম স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্ব তার অনেকদিন আসেনি।

পরে একদিন রাধাকে খাদারের কাছটায় নিয়ে চলে গিয়েছিল সে। ওদিকটায় তাদের কেউ চেনে না, আর খালিও জায়গাটা। পুলিশ হাইওয়েতে ধরলে কেস, কিন্তু এদিকে চেনা লোকে দেখে ফেললে সমস্যা বেশি, পুলিশের হাতে তবু পঞ্চাশটা টাকা গুঁজে দেওয়া যায়। একটা ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছের পেছনে গাড়ি লাগিয়েছিল বনমালী নিঝুম দুপুরে। আশেপাশে কেউ নেই, বড্ড গরম। লু-এর হাওয়ায় তার এলোমেলো হয়ে যাওয়া চুলে আঙুল চালিয়ে রাধা বলেছিল, 'তোর চুলের জন্য একটা জিনিস কিনে দেব, বুঝলি? সামনের মাসের মাইনেটা পাই। ডি-চল্লিশে যে-দাদা থাকে-না, সে একটা কী নাকি জেল লাগায় দেখি। খুব ভালো সেট হয়। এত তোর কায়দা, নারকেল তেলে হয় নাকি।'

গরম চায়ে জিভে ছ্যাঁকা লাগায় চিন্তাটা একটু ঘুরে গিয়ে ভালোই হয় বনমালীর। রাধার থেকে মনটা অল্পক্ষণের জন্য সরে যায়। আরেকটুও মুখে ঢালে। পোড়া জিভের ওপর গরম তরলের তীব্র জ্বালা মন থেকে সব ভাবনা বার করে দিতে পারে যদি।

একটু আগে পিন্টুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে চিন্তায় মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে বনমালীর। পিন্টু পাহাড়ির দিকে গাড়ি চালায়। বনমালীকে দেখে বলল, 'জানিস কী কেস? ওই আমাদের দিক থেকে একটা কাজের বউ আসত-না, রাধা? দেখিসনি? দেখেছিস নিশ্চয়ই, দেখলেই চিনতে পারবি। কী ডাঁসা মেয়ে! সে তিন-চার দিন হল ভেগেছে। ওর বর তো ডায়েরি করে এল। কয়েক দিন ধরে খুঁজছিল। এখন বুঝেছে ওভাবে পাবে না। পুলিশে না কি বলেছে বাড়িতে শেঠের টাকা এনে রেখেছিল, সেটা ঝেড়ে পালিয়েছে বউটা। ও যা মাল, ওকেই পুলিশ ক্যালান দিচ্ছে এখন। কিন্তু ও নাকি বলেছে কোন টোটোওলার সঙ্গে বউ-এর ইন্টুমিন্টু চক্কর চলছিল।'

বনমালীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। সে ভেবেছিল, রাধার বর তারক দাস তো সন্ধ্যে থেকেই নেশা করে থাকে, বাড়ির প্রতি উদাসীন। ঠেকায় বসে মাল খেয়ে পকেট খালি না করা পর্যন্ত বাড়ি ফেরে না। ফিরতে রোজই গভীর রাত, টলতে টলতে কোনোরকমে। রাধার না থাকাটা নিয়ে নিশ্চয়ই বেশি বাড়াবে না। ভালোও তো বাসে না। তবে? রাধা তো বলেছিল ওকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে ওর বর। কিন্তু এ তো নিজে

টাকা সরিয়ে দিয়ে রাধাকে ফাঁসাচ্ছে। কিন্তু রাধা তো আর ফাঁসবে না, ফাঁসবে বনমালী।

জিভের গরম জ্বালাটা ছাপিয়ে উদ্‌বেগ আবার জোয়ারের জলের মতো বেড়ে উঠতে থাকে। টাকাটা মিটিয়ে উঠে পড়ে বনমালী। মাথাটা একটু হলেও হালকা হয়েছে। বাঁচোয়া যে তাপস নতুন খদ্দেরটার সঙ্গে কী-একটা আলোচনায় এখনও মশগুল, বিশেষ আর প্রশ্ন-টশ্ন করে না।

কানাইদার ঘরের দিকে গাড়ি চালিয়ে দেয় বনমালী। কানাইদা অবশ্য আগেই পালিয়েছে। এত ভয় খায়। অবশ্য করবেই-বা কী, বনমালীর উপকার করতে গিয়ে বাজে ফেঁসেছে। অবশ্য ভাগ্যেরই দোষ। সবার জন্যই। কানাইদা নিজেই একদিন মাতাল হয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল যে, তার ঘরের কাছেপিঠে বেশি কেউ থাকে না। আর সে নিজেও তো প্রায় থাকেই না বলতে গেলে। বাড়ি খালিই থাকে, দরকার হলে বলতে। তাদের ব্যাপারটা কানাইদাই শুধু জানত। একজন কাউকে বলতে ইচ্ছে তো করে। আর কানাইদার সঙ্গে দারু নিয়ে বসাটা বনমালীর অনেক দিনের। তার গ্রামেরই লোক। বনমালী যখন প্রথম চলে আসে দেশ থেকে এদিকে, কানাইদাই তার একরকম সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

এখন অবশ্য মনে হচ্ছে, তাকে ঠেকাল না কেন কানাইদা? এক বার তো না বললেও পারত? কিছুটা দোষ তো তার ওপরেও বর্তায় বটেই। বনমালীর বউ-বাচ্চাকেও তো ভালো করেই চেনে কানাইদা। গ্রামে তাদের বাড়িতে অনেক বার গেছেও। বউ-এর জন্য দু-এক বার তো পয়সাও পাঠিয়েছে বনমালী কানাইদার হাত দিয়ে।

বউ-এর কথা মাথায় আসতে একটু অন্যমনস্ক হয় বনমালী। সেও গ্রাম থেকে দু-বেলা ফোন করছে আজকাল। ঠিক বুঝেছে, কিছু-একটা পাকিয়েছে সে।

কানাইদার ঘরের থেকে একটু দূরে গাড়ি রেখে একটা ভাঙাচোরা লোহার বেড়ার সঙ্গে শেকল দেয় বনমালী। ওই বাড়িগুলোর পরেই সমতলটা হঠাৎ শেষ হয়ে উঁচু-নীচু টিপি শুরু হয়ে যায়। কাঁটাঝোপ ভরতি। একেবারে নির্জন। গোরু চরতে যায় দু-একটা পেছনের দিকে, প্লাস্টিক চিবোতে চিবোতে বিকেলে ফেরে।

গাড়িটা রেখে হাঁটতে থাকে বনমালী। কানাইদার গলাটা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেদিন রাতে ফোন করে চাপা কিন্তু উত্তেজিত গলায় বলছে, 'কী করেছিস? তুই তো সব শেষ করে দিলি বুনো... সব শেষ করে দিলি।' ভয়ে ফ্যাসফ্যাস করছে কানাইদার আওয়াজ। আশপাশের শব্দ শুনে বনমালী বোঝে কোনো ট্রেনে কানাইদা, বলে, 'তুমি কোথায়? কোথায় যাচ্ছ কানাইদা? এখন যেও না।'

বনমালী কানাইদাকে ঘটনাটা আর বলতে পারেনি। দরজা বন্ধ করে চলে এসেছিল। ভেবেছিল রাতে ফোনে বলবে, তাও পারেনি, তারপর অপেক্ষা করছিল যে কানাইদাই করবে। কিন্তু কানাইদা যখন ফোন করল, তখন বনমালীর পুরো পরিকল্পনাটাই উলটে গেল। এরকম চট করে যে পালিয়ে যাবে, সেটা বোঝেনি বনমালী। কানাইদা শক্তপোক্ত লোক বলেই জানত। অবশ্য এখানে আর কী শক্ত হবে? আলমারিতে লাশ দেখলে কে আর শক্ত থাকে?

কানাইদার গলা কান্নায় বুজে আসছিল। বলল, 'আমার ঘরে তুই এরকম করলি বুনো? আমার জীবনটা এভাবে নষ্ট করে দিলি? আমার বাড়ির লোকেদের কথা এক বারও ভাবলি না।'

বনমালী বলল, 'ফিরে এসো কানাইদা, যেও না। তুমি চলে গেলে দু-জনেই ফাঁসব তো। আমরা বডিটা ঠিক সরিয়ে দেব। কিন্তু একা কী করে পারব? তুমি এসো, তোমাকে বোঝাচ্ছি, কী হয়েছিল। পুরোটাই ভুল করে, আমি কিছু...'— ওদিকে ফোন আসলে আগেই কেটে গেছে, বোঝে বনমালী। টাওয়ার নেই বোধ হয়। তারপর আর ফোন লাগে না। একটা গলা ধীর গতিতে বলে যায়, 'আপনি যে টেলিফোনের সঙ্গে সম্পর্ক করতে চাইছেন, সেটি এখন সীমানার বাইরে আছে।'

পুরো ব্যাপারটাই কীরকম অবাস্তব। একটা ঘোরের মতো। মাঝে মাঝে চ্যাট খুলে দেখেছে এর মধ্যে বনমালী, গত শনিবারের মেসেজ। রাধা বিকেলের কাজের জন্য বেরিয়েই বনমালীকে চ্যাট পাঠিয়েছিল। কাজে ছুটি চেয়ে নিয়েছিল রাধা আগের থেকেই। পাঁচ নম্বর গলির সামনে অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। টোটো তো সবাই ধরে, কাজের মেয়ে যে টোটোয় উঠবে, তাতে আর কে সন্দেহ করবে?

বনমালীও কানাইদাকে বলে একটা চাবি নিয়ে রেখেছিল।

সবদিক দেখতে গেলে, রাধার কপালটাই আসলে খারাপ। ছোটো থাকতে প্রেম করার সময় কখনো পায়নি। বাবা-মা দেশ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিল এদিকে, ওখানে এত বাচ্চাকাচ্চা— রাধার পরে পাঁচটা, আর ওপরে দুটো। দূর সম্পর্কের এক কাকার কাছে বড়ো হয় এখানেই। সতেরোয় পড়তেই স্কুল ছাড়িয়ে বিয়ে দিয়ে দেয় কাকা। বর তারকের তখন পঁয়ত্রিশ। রাধা প্রথম কয়েক বছর বুড়ো বরের দুঃখ কাটাতে কাটাতে যখন অবশেষে মনে করতে শুরু করল যে বয়সটা তেমনও কিছু-একটা নয়, ততদিনে তারক সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছে। বার্ধক্যের বুড়ো ততটাও নয়, যতটা মনের। আর নেশা করে করে শরীর মনেরও আগে ভেঙে গিয়েছে।

জীবনের এরকম মোক্ষম সময় যদি বনমালী তার টোটো নিয়ে এসে পড়ে, তাহলে আবেগপ্রবণ রাধার আর দোষ কী! অনাবৃষ্টিতে মাটি রুক্ষই ছিল, আর বনমালী এল বৃষ্টি নিয়ে। সে নিজে না বুঝলেও, আকাঙ্ক্ষার খুচরো আকর্ষণ থেকেই এসেছিল, প্রেমের দায়িত্ববোধ থেকে নয়। বনমালী টোটোতে সকাল-বিকেল কাজের বউগুলোকে পেছনের বস্তি অঞ্চল থেকে স্বচ্ছল পাড়ায় নিয়ে পৌঁছে দেয়, আবার ফেরত নিয়ে যায় সে। তাদের মধ্যে অল্পবয়েসি মেয়েগুলোর সঙ্গে একটু খুনসুটি সে করেই থাকত। তারাও তাকে পছন্দ করত। কিন্তু রাধার টান মধুর গন্ধে আসা মাছির মতো, পা আটকে যায়। সবার মধ্যে কি একরকম আকর্ষণ থাকে? কেউ কেউ শান্ত দিঘির মতো মেয়ে তো কেউ কেউ বর্ষার ঝোরা। রাধার টানে নিজের পরিবার, ডান দিক বাঁ-দিক, কিছুই আর মনে থাকে না বনমালীর।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে কানাইদার ঘর। দরজার তালায় সাবধানে চাবি ঘোরায় বনমালী, আওয়াজ যতটা কম করা যায়। যদিও কেই-বা শুনবে দিনের বেলা এদিকে। তাও, আজকে লাশটা সরাতেই হবে। বেশি জানান না দেওয়াই ভালো। এখানে সব ঘরবাড়ি ছেড়ে কাজ করতে আসা ছেলেছোকরাদেরই ভিড়। বেশিরভাগই সকাল বেলা বেরিয়ে যায়। যারা বেরোয় না, তারা প্রায় সবাই রাতে উদোম খেটে ফিরে এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সারাদিন খেটে ফেরার ঘুমটাই আলাদা, বোমা পড়লেও ভাঙবে না, আলগোছে ভাবে বনমালী, ঘুমোয়নি কতদিন সে!

দরজা খুলে আসন্ন বিকেলের ছায়াচ্ছন্ন ঘরে ঢোকে বনমালী। সেই রাতের মতোই প্রায় সব কিছু। নাইলনের দড়িতে এখনও কানাইদার দুটো ভাঁজ করা লুঙ্গি ঝুলছে। ঘরের কোনায় কুঁজোটা ধাক্কাধাক্কিতে উলটে গিয়েছিল, ভাঙেনি অবশ্য। সেটা এখনও কাত হয়েই পড়ে আছে। ঘরের ডান দিকে সিঙ্গল খাট, তার ওপর চাদরটা কোঁচকানো। বনমালীই কিনে নিয়ে এসেছিল চাদরটা ঝটিতে। কানাইদার ঘরে রাধাকে নিয়ে আসার আগে সকালে এক বার তদারকি করতে এসেছিল। ভীষণ মলিন দশা সব কিছুর। চাদর তো নোংরাই, আর দুটো বালিশের কভার যা তেল চিটচিটে, তাতে মাথা রাখতে ইচ্ছা করবে না। বিছানার ওপর ধস্তাধস্তিতে সব এলোমেলো। চাদর উঠে নীচের শতচ্ছিন্ন ছোবড়া বার হওয়া তোশকটা

দেখা যাচ্ছে। একটা বালিশের কভার অর্ধেক উঠে ভেতরের তৈলাক্ত ওয়াড়টা বেরিয়ে গেছে। ঘরের বাঁ-দিকে একটা ভাঙাচোরা কাঠের আলমারি। সেদিকে তাকিয়ে বনমালী ভাবে, ওইখানে রাধা শুয়ে আছে।

মনকে শক্ত করে বনমালী। তিন দিন কেটে গেছে। হেমন্তের আমেজে গরম খুব নেই বলে এখন। থাকলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই গন্ধ বেরিয়ে পাড়ায় লোকেদের জানান দিত। আলমারিটা পুরোনো কাঠের, ভাঙাচোরা। বড়োলোক বাড়ির থেকে কাওয়াড়িতে বেচে দেওয়া বেওয়ারিশ মাল। কেউ তুলে এনে রেখেছিল। ভেতরে ডাঁই করে রাখা ছিল সোঁদা কাপড়-চোপড়। তার ওপরেই কুঁকড়ে রাধার বডিটাকে শুইয়ে গিয়েছিল বনমালী। কাপড়ে ঢাকা দিয়ে, যেরকম পারে। মুখের ওপর ঢাকা টানতে গিয়ে দেখেছিল রাধার বিস্ফারিত চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রাণ নেই, কিন্তু চোখের কাচে শেষ মুহূর্তের বিমূঢ় বিস্ময় আঁকা হয়ে আছে। গভীর ভরসার জায়গা হঠাৎ ভেঙে গেলে মানুষ যেমন চমকে যায়, সেই দৃষ্টি। তাকাতে পারেনি বনমালী। চাপাও আর দিতে পারেনি মুখের ওপর, তাড়াতাড়ি করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল।

এখন সেটাই আফশোস হয় বনমালীর, রাধা ওভাবেই তাকিয়ে আছে এখনও নিশ্চয়ই, দরজা খুলেই চোখে চোখ পড়বে তার।

তাও। সাহস করে আলমারির দরজায় টান দেয় সে।

কিন্তু দরজার ওদিকটায় রাধা নেই। তাক লেগে গিয়ে ক্লান্তি ভুলে যায় হঠাৎ বনমালী। আলমারির ভেতরে তো বাইরের মতোই বিকেলের পড়ন্ত আলো। একটা ছোট্ট উঠোন থেকে ওপাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে, ঠিক নীচের সিঁড়িটার মতোই। ভাঙাচোরা গোছের। কী আশ্চর্য!

আলমারির ভেতরে পা বাড়ায় বনমালী। সিঁড়ির হাতলগুলো অনেক দিনের রোদ-বৃষ্টিতে ক্ষয়ে বিবর্ণ, শুধু ভেতর দিকটায়— যেখানে বৃষ্টির ছাট বা রোদের তাত লাগে না— সেখানে কোথাও কোথাও আগেকার রং উঁকি মারে। হাতলে হাত রেখে ওপর দিকে পা বাড়ায়। সিঁড়ির ওপরে একচিলতে দাঁড়াবার জায়গা, তার সামনে আবার কানাইদার দরজা।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে বনমালী।

কানাইদার লুঙ্গি দুটো ঝুলছে নাইলনের দড়িতে। ঘরের কোনায় কুঁজোটা কাত হয়ে পড়ে আছে। আর সিঙ্গল খাটের এক কোণে বসে রাধা। বনমালীকে দেখে বলে, 'এত দেরি করলি কেন বুনো? কতক্ষণ বসে আছি একা একা!'

বনমালী কী বলবে জানে না। রাধা কি জানে না সে মারা গেছে? বলে, 'একটু ওদিকে খবর নিতে গিয়েছিলাম। তোর স্বামী তো গিয়ে পুলিশে লিখেছে, তুই চুরি করে পালিয়েছিস।'

রাধা হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে, তার যেরকম হাসি, আগের মতোই খানিকটা, আবার নয়ও। একটা বিষণ্ণতা কোথায় যেন রয়েছে। বলে, 'কেন? তুইও তো ঠকালি বুনো। ভালো তো বাসিসনি কোনোদিন, আমার বরকে আর আলাদা কী দোষ দিই? ভালোবেসে যদি মেরেই ফেলবি, তাহলে না বাসাই বরং ভালো ছিল।'

বনমালীর ভেতরে একটা কান্না গুমরে উঠছে। 'রাধা, আমার ওপর যে কী চলছে, কী করে বোঝাব? তুই যাওয়ার পর থেকে আমি যে কীভাবে আছি, যদি বুঝতিস।'

মাটিতে বসে পড়ে বনমালী। একটা গোঙানি ফুঁপিয়ে উঠে আসছে ভলকে ভলকে। পুরো শরীর জ্বলছে যেন বনমালীর, চোখ জ্বলছে, কানে চাপ। গত কয়েক দিনের সব কিছু তারই দোষে। কিন্তু বুঝে তো কিছুই করেনি সে। কান্নার মাঝে মাঝে বলে, 'রাধা, ইচ্ছে করে করিনি, তুই তো বোঝ, তুই তো অন্তত বুঝবি?'

আর রাধা ছাড়া কেই-বা বুঝবে? সেদিন দুপুরে কেই-বা ছিল এদিকে। রাধার গলাটা যখন দুই হাতের মধ্যে সজোরে টিপে ধরেছিল বনমালী, তখন দূরে শুধু একঝাঁক টিয়া ডাকছিল। এদিকে টিয়া খুব বেশি, রুক্ষ জায়গা তো। এসব জায়গার ফল বোধ হয় ওদের পছন্দ। এইসব ভাবতে ভাবতেই তার শরীরের নীচে নিস্তেজ হয়ে আসে রাধার দেহ। আর কোনো আওয়াজ ছিল কি? পড়ন্ত দুপুরের যে ঝিঁঝিধরা আওয়াজটা থাকে, সেটা বোধ হয়।

রাধা তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তারপর বলে, 'আমি কী করে জানব রে? তুই বল, আমি শুনি।' তবে রাধার চোখে আর রাগ নেই, হয়তো মায়াই কিছুটা। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে পায়ের কাছে বসে পড়ে বনমালী। রাধা চুলে হাত বুলিয়ে দেয় তার। সেইদিন অশ্বত্থ গাছের পেছনে রুক্ষ লু-বওয়া দুপুরে রাধা যখন চুলে হাত বুলিয়েছিল, অনেক কিছু ভেবেছিল বনমালী। কিন্তু প্রেম ছিল না তার চিন্তায়। চুলটা এলোমেলো হয়ে গেল, ভেবেছিল। তারপর ভেবেছিল কীভাবে আড়ালে পাওয়া যায় রাধাকে, স্পর্শের তাড়নায় সেই মুহূর্তটাকে ভুলে গিয়ে পরের কথা ভাবতে শুরু করেছিল। এখন রাধার হাতে সেই প্রাণ নেই, কিন্তু এই প্রথম ছোঁয়াটা অনুভব করতে পারল বনমালী।

'আমার কী হয়েছিল জানি না রাধা। আসলে অনেক দিন পর তো... তুই জানিস, নিজেকে সামলাতে পারিনি...'

কেন যে রাধাকে মেরে ফেলল সে, সত্যি কথা, এখনও বুঝে উঠতে পারেনি বনমালী। মদ খেয়ে চিন্তাগুলো একটু ঘেঁটে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সে তো কারো গায়ে হাতও তোলেনি সেভাবে কোনোদিন। মদও তো খেয়েই থাকে অল্প-বিস্তর, সেটাকেও দোষ দেয় কী করে।

আসলে কোনো জিনিস আছড়ে ভেঙে ফেলতে না পারলে, সেটা আর নিজের হল কোথা থেকে?

রাধাও আসলে তার তাড়াটা বুঝতে পারেনি। বনমালী অবৈধ আনন্দের যাবতীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। মদের মাঝারি বোতল, দুটো গেলাস, কন্ডোমের প্যাকেট। বিছানা পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা, বালিশের কভার থেকে নতুন মাড়ের গন্ধ। রাধার সংকোচ হওয়াটা স্বাভাবিক। তার মনে মুক্তির ঝোড়ো বাতাস বইছিল সেদিন। বাড়িতে বলেছিল, দেরি হবে কাজ থেকে ফিরতে, যে-বাড়িতে কাজ করে, সেখানে লোক খাবে।

কিন্তু বনমালীর হড়বড় করা দেখে মনটা হঠাৎ দমে গিয়েছিল রাধার। তার জন্য জোগাড় করা সরঞ্জামে যেন একটা অন্যায়ের ইঙ্গিত। রাধাও কি এটাই চায়নি? বোধ হয় চেয়েছিল, তবে এভাবে চায়ওনি। অন্তত দুটো কথা তো বলবে বনমালী। বেশি না বললেও চলবে। কিন্তু তার নতুন কানের দুলটা লক্ষ করে বলবে, 'কবে কিনলি?' সকালে বেরিয়েই আসছিল, যেরকম রোজ আসে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় এই দুলটার কথা। গত বছর সবাই যখন বাসে করে লালচক বেড়াতে গেল, রাধা শখ করে কিনেছিল সেখানকার বাজার থেকে। জিনিসটার দামও আছে, তারক জানলে আর আস্ত রাখত না। কিন্তু তারককে বলবে কেন সে? ও কি তাকে জিজ্ঞেস করে যায় নেশা করতে?

অথচ গেলাসে মদ ঢেলে খেতে শুরু করেছে ততক্ষণে বনমালী, তার হাতেও দিয়েছে। আর সেই সস্তা মদ হাতে নিয়ে তার কালচে লাল জলে রাধা বনমালীর ছায়া দেখে, বনমালীর পেছনের জানালা দিয়ে আসা হালকা আলোয় তার অবয়ব ঠিক তারকেরই মতো। কতটাই-বা আলাদা, ভাবে রাধা। মুখ-চোখ একটু ভেঙেচুরে আবার তৈরি করে নিলে তো সেই একই লোক, কান, নাক, চোখ— একই ইচ্ছে। বাতাসের অভাব মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল চলে যাবে। কিন্তু বনমালী যেতে দেবে কেন?

এতটাই যদি এসেছে, চলে যাবে কেন? আর রাধাও জেদি মেয়ে, যাবেই।

দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে বনমালীর। এর মধ্যে পুরোটা ভাবেনি কখনো। মনের এক অন্ধকার কোণে আটকে রেখে দিয়েছিল দৃশ্যগুলো। রাধার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে বনমালী, সেখানে বিদ্বেষ নেই।

চমকে উঠে বনমালী বলে, 'সত্যি ভালোবাসতে পারিনি তোকে রাধা। বুঝতে পারিনি আসলে। আমি সত্যি জানতাম না।' গলা আটকে যায় বনমালীর তীব্র অনুতাপে, ওঠার চেষ্টা করে সে।

রাধা বলে, 'কোথায় যাবি বুনো?'

'পালাতে হবে রাধা। পুলিশ এল বলে। ওরা তো এতক্ষণে জেনেই গেছে সব।'

'আরেকটু বসে যা', রাধা বলে। 'এই সময়টা কী সুন্দর।' ■